পঞ্চম অধ্যায়

# বুঝে পড়ি লিখতে শিখি

## ১ম পরিচ্ছেদ

## প্রায়োগিক লেখা

নিচের লেখাটি জাহানারা ইমামের ‘একাত্তরের দিনগুলি’ নামের বই থেকে নেওয়া হয়েছে। জাহানারা ইমামের পুত্র রুমী গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং শহিদ হয়েছিলেন। এজন্য জাহানারা ইমাম ‘শহিদ জননী’ নামে পরিচিত।

## একাত্তরের দিনগুলি

### জাহানারা ইমাম

**১৯ মার্চ ১৯৭১, শুক্রবার**

আজ রুমী অভিনব স্টিকার নিয়ে এসেছে— ‘একেকটি বাংলা অক্ষর একেকটি বাঙালির জীবন’। বাংলায় লেখা স্টিকার এই প্রথম দেখলাম। রুমী খুব যত্ন করে স্টিকারটা গাড়ির পেছনের কাচে লাগাল। স্টিকারের পরিকল্পনা ও ডিজাইন করেছেন শিল্পী কামরুল হাসান। উনি অবশ্য নিজেকে শিল্পী না বলে ‘পটুয়া’ বলেন। কয়েকদিন আগে ‘বাংলার পটুয়া সমাজ’ বলে একটা সমিতি গঠন করেছেন। গত শুক্রবার এই সমিতির একটা সভাও হয়ে গেল।

‘বাংলার পটুয়া সমাজ’-এর এই সভাতে শাপলা ফুলকে সংগ্রামী বাংলার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার এক প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।

**২২ মার্চ ১৯৭১, সোমবার**

ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও গতকাল একমুহূর্ত বিশ্রাম পায়নি বাড়ির কেউ। সারাদিনে এত মেহমান এসেছিল যে চা-নাশতা দিতে দিতে সুবহান, বারেক, কাশেম সবাই হয়রান হয়ে গিয়েছিল। আমিও হয়েছিলাম, কিন্তু দেশব্যাপী দ্রুত প্রবহমান ঘটনাবলির উত্তেজনায় অন্য সবার সঙ্গে আমিও এত টগবগ করেছি যে টের পাইনি কোথা দিয়ে সময় কেটে গেছে।

রুমী, জামী আজ সাড়ে আটটাতেই নাশতা খাওয়া শেষ করে কোথায় যেন গেছে।

আগামীকাল ২৩শে মার্চ প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। এর জন্য সারাদেশে প্রচণ্ড আলোড়ন ও উত্তেজনা। জনমনে বিপুল সাড়া ও উদ্দীপনা।

**২৩ মার্চ ১৯৭১, মঙ্গলবার**

আজ প্রতিরোধ দিবস।

খুব সকালে বাড়িসুদ্ধ সবাই মিলে ছাদে গিয়ে কালো পতাকার পাশে আরেকটা বাঁশে ওড়ালাম স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন পতাকা। বুকের মধ্যে শিরশির করে উঠল। আনন্দ, উত্তেজনা, প্রত্যাশা, ভয়, অজানা আতঙ্ক— সবকিছু মিশে একাকার অনুভূতি।

নাশতা খাওয়ার পর সবাই মিলে গাড়িতে করে বেরোলাম— খুব ঘুরে বেড়ালাম সারা শহরে বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে। সবখানে সব বাড়িতে কালো পতাকার পাশাপাশি সবুজ-লালে-হলুদে উজ্জ্বল নতুন পতাকা পতপত করে উড়ছে। ফটো তুললাম অনেক।

সবচেয়ে ভালো লেগেছে শহিদ মিনারের সামনে গিয়ে। কামরুল হাসানের আঁকা কয়েকটা দুর্দান্ত পোস্টার দেখলাম। মিনারের সিঁড়ির ধাপের নিচে সার সার সেঁটে রেখেছে। (বইয়ের কিছু অংশ)

## শব্দের অর্থ

**অভিনব:** নতুন।

**আলোড়ন:** যা নাড়া দেয়।

**উদ্দীপনা:** যা উদ্দীপ্ত করে।

**একেকটি বাংলা অক্ষর একেকটি বাঙালির জীবন:** বাংলা ভাষার একেকটি অক্ষরের পেছনে লুকিয়ে আছে ভাষা-আন্দোলনে আত্মদানের স্মৃতি।

**ঘটনাবলি:** বহু ঘটনা।

**টগবগ করা:** অস্থির হওয়া।

**ডিজাইন:** নকশা।

**পরিকল্পনা:** কী করতে হবে তা ঠিক করা।

**পোস্টার:** লিখে বা ছবি এঁকে কিছু বোঝানো হয় এমন বড়ো কাগজ।

**প্রতিরোধ দিবস:** ১৯৭১ সালের ২৩শে মার্চে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পালিত প্রতিবাদ দিবস।

**প্রতীক:** চিহ্ন।

**প্রবহমান:** যা বয়ে চলেছে।

**প্রস্তাব:** যা করতে চাওয়া হয়।

**শিরশির:** উত্তেজনার অনুভূতি।

**সবুজ-লালে-হলুদে উজ্জ্বল পতাকা:** বাংলাদেশের পতাকার প্রথম নকশা ছিল সবুজের ভেতর লাল বৃত্ত, আর বৃত্তের মধ্যে হলুদ রঙে বাংলাদেশের মানচিত্র।

**সভা:** মিটিং।

**সমিতি:** কয়েকজন মিলে তৈরি করা সংগঠন।

**সাড়া:** একমত হওয়ার মনোভাব।

**সার সার সেঁটে রাখা:** সারি করে আঠা দিয়ে লাগিয়ে রাখা।

**স্টিকার:** কোথাও লাগানো যায় এমন কাগজের টুকরা।

## পড়ে কী বুঝলাম

ক. এটি কোন বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে? _____

_____

_____

খ. লেখাটি কোন সময়ের ও কয়দিনের ঘটনা? _____

_____

_____

গ. লেখক কী কী কাজের উল্লেখ করেছেন? _____

_____

_____

ঘ. লেখার তিন অংশের শুরুতে তারিখ দেওয়া কেন? _____

_____

_____

ঙ. এই লেখা থেকে নতুন কী কী জানতে পারলে? _____

_____

## বলি ও লিখি

'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় লেখক যা বলেছেন, তা নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

## রোজনামচা লিখতে শিখি

প্রতিদিন অনেক ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনা নিজের মতো করে লিখে রাখা যায়। এভাবে লিখে রাখা বিবরণকে রোজনামচা বলে। তুমিও নিয়মিত রোজনামচা লিখতে পারো। রোজনামচা লেখার সময়ে কয়েকটি বিষয় খেয়াল রেখো:

১. শুরুতে তারিখ এবং জায়গার নাম লিখে রাখতে হয়।
২. বর্ণনা পূর্ণবাক্যে লিখতে হয়।
৩. বাক্যে এমন ক্রিয়া শব্দ ব্যবহার করতে হয়, যা দিয়ে বোঝা যায়, কাজটি হয়ে গেছে। যেমন: সকালে সাঁতার কাটলাম। অথবা, সকালে সাঁতার কেটেছি।
৪. ব্যক্তিগত বিবরণের পাশাপাশি ওই দিনে ঘটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথাও লেখা যায়।

মনে রেখো, অনুমতি ছাড়া অন্যের রোজনামচা পাঠ করা ঠিক নয়।

## রোজনামচা লিখি

এখন তুমি তিন-চার দিনের ঘটনা রোজনামচার আকারে লিখে শিক্ষককে দেখাও।

## ২য় পরিচ্ছেদ

## বিবরণমূলক লেখা

জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে, অনেক অভিজ্ঞতা থাকে, যা লিখে রাখা যায়। লিখে রাখলে কখনো তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার বিবরণ নিচে দেওয়া হলো। এটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা 'আমার দেখা নয়াচীন' বই থেকে নেওয়া হয়েছে। ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে চীনের একটি সম্মেলনে যোগ দিতে বঙ্গবন্ধু চীন সফরে গিয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালে এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি 'আমার দেখা নয়াচীন' বইটি লেখেন। এটি ২০২০ সালে ছাপা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং জাতির পিতা।

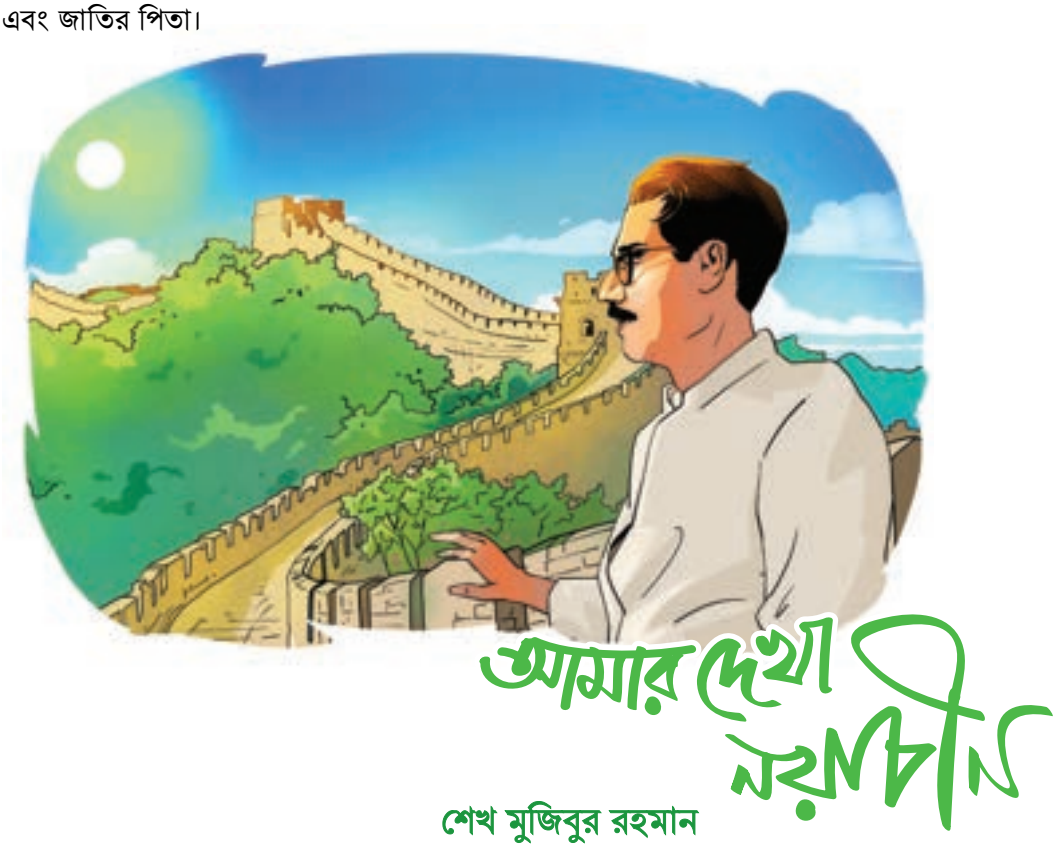


আমরা মিউজিয়ামে পৌঁছালাম। অনেক নিদর্শন বস্তু দেখলাম। উল্লেখযোগ্য বেশি কিছু দেখেছিলাম বলে মনে হয় না। তবে অনেক পুরানো কালের স্মৃতি দেখা গেল।

পরে আমরা লাইব্রেরি দেখতে যাই। শুনলাম সাংহাই শহরের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো পাবলিক লাইব্রেরি। খুবই বড়ো লাইব্রেরি সন্দেহ নেই, ব্যবস্থাও খুব ভালো। রিডিং রুমগুলো ভাগ ভাগ করা রয়েছে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্যও একটা রুম আছে। সেখানে দেখলাম ছোটোদের পড়বার উপযুক্ত বইও আছে বহু, ইংরেজি বইও দেখলাম।

লাইব্রেরির সাথে ছোটো একটা মাঠ আছে, সেখানে বসবার বন্দোবস্ত রয়েছে। মাঠে বসে পড়াশোনা করার মতো ব্যবস্থা রয়েছে। আমার মনে হলো কলকাতার ইমপেরিয়াল লাইব্রেরির মতোই হবে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, লাইব্রেরিটা বহু পুরানো।

সেখান থেকে আমরা অ্যাকজিবিশন দেখতে যাই। আমাদের জন্য বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। নতুন চীন সরকার কী কী জিনিসপত্র তৈরি করেছেন তা দেখানো হলো। কত প্রকার ইনস্ট্রুমেন্ট করেছে, তাও দেখাল। আমরা ফিরে এলাম হোটেলে।

এক ঘণ্টা পরে আবার বেরিয়ে পড়লাম সাংহাই শহরের পাশে যে নদী বয়ে গেছে, তা দেখবার জন্য। আমাদের দেশের মতোই নৌকা, লঞ্চ চলছে এদিক ওদিক। নৌকা বাদাম দিয়ে চলে।

পরে ছেলেদের খেলার মাঠে যাই, দেখি হাজার তিনেক ছেলেমেয়ে খেলা করছে। শিক্ষকরাও তাদের সাথে আছেন। আমাদের যাওয়ার সাথে সাথে কী একটা শব্দ করল, আর সকল ছেলেমেয়ে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল এবং আর একটা শব্দ হওয়ার পরে আমাদের সালাম দিলো, আমরা সালাম গ্রহণ করলাম। তারা স্লোগান আরম্ভ করল। আমরা বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

দোভাষীকে বললাম, 'চলুন যেখানে সবচেয়ে বড়ো বাজার, সেখানে নিয়ে চলুন।' সেখানে পৌঁছেই একটা সাইকেলের দোকানে ঢুকলাম। সেখানে চীনের তৈরি সাইকেল ছাড়াও চেকশ্লোভাকিয়ার তৈরি তিন চারটা সাইকেল দেখলাম। তাতে দাম লেখা ছিল। চীনের তৈরি সাইকেল থেকে তার দাম কিছু কম। আমি বললাম, 'বিদেশি মাল তা হলে কিছু আছে?' দোকানদার উত্তর দিলো, 'আমাদের মালও তারা নেয়।' আমি বললাম, 'আপনাদের তৈরি সাইকেল থেকে চেকশ্লোভাকিয়ার সাইকেল সস্তা। জনসাধারণ সস্তা জিনিস রেখে দামি জিনিস কিনবে কেন?'

দোকানি জানায়: 'আমাদের দেশের জনগণ বিদেশি মাল খুব কম কেনে। দেশি মাল থাকলে বিদেশি মাল কিনতে চায় না, যদি দাম একটু বেশিও দিতে হয়।' সাংহাইয়ের অনেক দোকানদার ইংরেজি বলতে পারে।

জিনিসপত্রের দাম বাড়তে পারে না, কারণ জনসাধারণ খুব সজাগ হয়ে উঠেছে। যদি কেউ একটু বেশি দাম নেয়, তবে তার আর উপায় নেই! ছেলে বাপকে ধরিয়ে দিয়েছে, স্ত্রী স্বামীকে ধরিয়ে দিয়েছে, এ রকম বহু ঘটনা নয়াচীন সরকার কায়েম হওয়ার পরে হয়েছে। তাই দোকানদারদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। সরকার যদি কালোবাজারি ও মুনাফাখোরদের ধরতে পারে, তবে কঠোর হস্তে দমন করে। এ রকম অনেক গল্প আমাদের দোভাষী বলেছে। রাতে হোটেলে ফিরে এলাম। আগামীকাল সকালে আমরা রওনা করব। (বইয়ের কিছু অংশ)

## শব্দের অর্থ

**অ্যাকজিবিশন:** প্রদর্শনী বা মেলা।

**ইনস্ট্রুমেন্ট:** যন্ত্রপাতি।

**ইমপেরিয়াল লাইব্রেরি:** একটি লাইব্রেরির নাম।

**উল্লেখযোগ্য:** উল্লেখ করার মতো।

**কঠোর হস্তে দমন করা:** কঠিন শাস্তি দেওয়া ।

**কালোবাজারি:** অবৈধ কেনা-বেচা।

**চেকশ্লোভাকিয়া:** ইউরোপ মহাদেশের একটি দেশ।

**দোভাষী:** যিনি এক ভাষার কথা অন্য ভাষায় অনুবাদ করে শোনান।

**নয়াচীন:** নতুন চীন।

**নিদর্শন বস্তু:** যেসব বস্তু জাদুঘরে দেখানো হয়।

**পাবলিক লাইব্রেরি:** যে লাইব্রেরিতে গিয়ে সবাই বই পড়তে পারে।

**বন্দোবস্ত:** ব্যবস্থা।

**বাদাম দিয়ে চলে:** পাল তুলে চলে।

**বিদেশি মাল:** বিদেশি দ্রব্য।

**ভীতির সঞ্চার হওয়া:** ভয় তৈরি হওয়া।

**মিউজিয়াম:** জাদুঘর।

**মুনাফাখোর:** যে অতিরিক্ত লাভ করতে চায়।

**রিডিং রুম:** পড়ার ঘর।

**সজাগ:** সতর্ক।

**সরকার কায়েম হওয়া:** সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

**সাংহাই:** চীনের একটি বন্দর নগরী।

**স্লোগান:** উঁচু স্বরে উচ্চারিত সমবেত কণ্ঠের দাবি।

## পড়ে কী বুঝলাম

ক. লেখক এখানে কীসের বিবরণ দিয়েছেন? _____

খ. বিবরণটি কোন সময়ের ও কোন দেশের? _____

গ. এই বিবরণে বাংলাদেশের সাথে কী কী মিল-অমিল আছে? _____

ঘ. লেখাটিতে চীনের মানুষের দেশপ্রেমের কোন নমুনা পাওয়া যায়? _____

ঙ. এই লেখা থেকে নতুন কী কী জানতে পারলে? _____

## বলি ও লিখি

'আমার দেখা নয়াচীন' রচনায় লেখক যা বলেছেন, তা নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

## কীভাবে লিখব বিবরণ

বিবরণ লেখার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। দেখার ভঙ্গি ও লেখার ধরন একেক জনের একেক রকম। এমনকি, একই বিষয় নিয়ে দুজন লেখকের লেখাও এক রকম হয় না। তবে, বিবরণ লেখার সাধারণ কিছু নিয়ম নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. প্রথমে লেখার বিষয় ঠিক করতে হয়।

২. বিষয়টির কোন কোন দিক নিয়ে লেখা যায়, তা ভাবতে হয়।

৩. লেখার সময়ে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করে তার জবাব খুঁজতে হয়। এক্ষেত্রে কী, কেন, কীভাবে, কোথায় ইত্যাদি প্রশ্ন কাজে লাগতে পারে।

৪. লেখায় ধারাবাহিকতা থাকা দরকার।

৫. আবেগ-বর্জিত সহজ-সরল ভাষায় বিবরণ তৈরি করতে হয়।

৬. বিষয়ের সাথে মিল রেখে লেখাটির একটি শিরোনাম দিতে হয়।

## বিবরণ লিখি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষের বাইরে যাও। চারপাশ ভালো করে দেখো। লেখার জন্য এর মধ্য থেকে কোনো একটি বিষয় বাছাই করো। বিষয় হতে পারে গাছপালা, পশুপাখি, রাস্তা, নদী, মানুষ, প্রতিষ্ঠান কিংবা অন্য যে কোনো কিছু। এমনকি এ সময়ে দেখা কোনো ঘটনাও লেখার বিষয় হতে পারে। বাছাই করা বিষয়ের উপর ১০০ থেকে ১৫০ শব্দের মধ্যে একটি বিবরণ লেখো।

•৩য় পরিচ্ছেদ

# তথ্যমূলক লেখা

তথ্যকে সাজিয়ে তথ্যমূলক লেখা তৈরি করা হয়। নিচে একটি তথ্যমূলক লেখা দেওয়া হলো। এটি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে লেখা। এটি রচনা করেছেন সেলিনা হোসেন। তিনি বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত লেখক।

## রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

### সেলিনা হোসেন

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জহীর মোহাম্মদ আবু আলী সাবের প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। পায়রাবন্দ গ্রামে তাঁদের বাড়িটি ছিল বিশাল। সাড়ে তিন বিঘা জমির মাঝখানে ছিল তাঁদের বাড়িটি।

রোকেয়া যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে সময়ে বাঙালি মুসলমান সমাজে শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ছিল না। ফলে মুসলমানরা শিক্ষাদীক্ষা, চাকরি, সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিক থেকে পিছিয়ে ছিল। মেয়েদের অবস্থান ছিল খুবই শোচনীয়। পর্দাপ্রথা কঠোরভাবে মানা হতো বলে মেয়েদের শিক্ষালাভের কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু মেধাবী রোকেয়ার প্রবল আগ্রহ ছিল লেখাপড়ার প্রতি।

রোকেয়ার বড়ো দুই ভাই কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। বোনদের আগ্রহ দেখে বড়ো ভাই ইব্রাহীম সাবের বোন করিমুন্নেসা ও রোকেয়াকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। করিমুন্নেসার অনুপ্রেরণায় রোকেয়া বাংলা সাহিত্য রচনা ও চর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। রোকেয়া তাঁর রচিত 'মতিচূর' দ্বিতীয় খন্ড করিমুন্নেসাকে উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গ-পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'আপাজান! আমি শৈশবে তোমারই স্নেহের প্রসাদে বর্ণপরিচয় পড়িতে শিখি । অপর আত্মীয়গণ আমার উর্দু ও ফারসি পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাঙ্গালা পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। একমাত্র তুমিই আমার বাঙ্গালা পড়ার অনুকূলে ছিলে।' নানা বাধা এড়িয়ে রোকেয়া আপন সাধনায় বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাই রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন একজন অসাধারণ নারী।

১৮৯৭ সালে কিশোরী বয়সেই বিহারের ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে রোকেয়ার বিয়ে হয়। স্বামীর সহযোগিতায় তিনি তাঁর পড়াশোনার চর্চা চালিয়ে যান। বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯০২ সালে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'নবপ্রভা' পত্রিকায় ছাপা হয় তাঁর প্রথম রচনা 'পিপাসা'। বিভিন্ন সময়ে তাঁর রচনা নানা পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে। ১৯০৫ সালে প্রথম ইংরেজি রচনা 'সুলতানাজ ড্রিম' মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় ছাপা হয়। তাঁর রচনা সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

১৯০৯ সালে সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন মারা যান। রোকেয়া ভাগলপুরে তাঁর নামে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তখন স্কুলের ছাত্রী ছিল পাঁচজন। ১৯১১ সালে এই স্কুলটি তিনি কলকাতায় স্থানান্তর করেন। শুরুতে ছাত্রীসংখ্যা ছিল আট। আস্তে আস্তে স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

রোকেয়া বাঙালি মুসলমান মেয়েদের শিক্ষিত করার জন্য শুধু স্কুলই প্রতিষ্ঠা করেননি, ঘরে ঘরে গিয়ে মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য বাবা-মায়ের কাছে আবেদন-নিবেদন করেছেন। এই কাজে তিনি ছিলেন একজন নিরলস পরিশ্রমী-কর্মী । তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে নারীশিক্ষার অগ্রগতি সূচিত হয়। মেয়েরা ধীরে ধীরে শিক্ষার আলোর দিকে এগোতে থাকে।

১৯১৬ সালে তিনি 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' নামে একটি মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে দুস্থ নারীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করা হতো। তাদের হাতের কাজ শেখানো হতো, সামান্য লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থাও ছিল। এক কথায় এই সংগঠনটির লক্ষ্য ছিল সমাজের সাধারণ দুঃস্থ নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলা।

রোকেয়ার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা পাঁচটি: 'মতিচূর' প্রথম খন্ড (১৯০৪) , 'সুলতানাজ ড্রিম' (১৯০৮), 'মতিচূর' দ্বিতীয় খন্ড (১৯২২), 'পদ্মরাগ' (১৯২৪) ও 'অবরোধবাসিনী' (১৯৩১)।

রোকেয়া এই উপমহাদেশের একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। নারীশিক্ষার অগ্রদূত হিসেবে সমগ্র বাঙালি সমাজে তিনি শ্রদ্ধেয়। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় তিনি দুইভাবে নারীদের মুক্তির পথ দেখেছিলেন। এক. মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করে, দুই. নিজের রচনায় নারীমুক্তির দিকনির্দেশনা দিয়ে।

তিনি ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন ।

## শব্দের অর্থ

**অক্লান্ত :** ক্লান্তিহীন।

**অগ্রগতি :** এগিয়ে চলা।

**অগ্রদূত :** পথপ্রদর্শক।

**অনুকূলে :** পক্ষে।

**অনুপ্রেরণা :** উৎসাহ।

**আগ্রহ :** ইচ্ছা।

**আত্মপ্রকাশ :** আবির্ভাব।

**আবেদন-নিবেদন :** অনুরোধ।

**উৎসর্গ-পত্র :** বইটি কাকে উৎসর্গ করা হয়েছে বইয়ের যে পাতায় তা লেখা থাকে।

**উপমহাদেশ :** দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ অঞ্চল।

**খন্ড :** অংশ।

**ঘোর :** প্রবল।

**ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট :** সরকারি কর্মকর্তা।

**দিকনির্দেশনা :** পথ দেখানো।

**দুঃস্থ :** অসহায়।

**দূরদৃষ্টিসম্পন্ন :** ভবিষ্যতে কী হবে তা যিনি আন্দাজ করতে পারেন।

**নারীমুক্তি :** নারীর স্বাধীনতা।

**নিরলস :** যার আলস্য নেই।

**পর্দাপ্রথা :** নারীদের ঘরের বাইরে না যাওয়ার সামাজিক রীতি।

**পারদর্শী :** দক্ষ।

**প্রচলন :** চালু।

**প্রবল :** খুব।

**প্রভূত :** প্রচুর।

**বর্ণপরিচয় :** বর্ণমালা শেখার বই।

**বাঙ্গালা :** বাংলা ভাষা।

**বিংশ শতাব্দী :** বিশ শতক (১৯০১ - ২০০০ সাল)।

**বিশাল :** অনেক বড়ো।

**ভাগলপুর :** বিহারের একটি জেলাশহর।

**ভূসম্পত্তি :** জমিজমা।

**মাদ্রাজ :** ভারতের একটি শহর। বর্তমান নাম চেন্নাই।

**শোচনীয় :** অত্যন্ত খারাপ।

**সংগঠন :** প্রতিষ্ঠান।

**সামাজিক প্রতিষ্ঠা :** সমাজে সম্মানজনক অবস্থা নিয়ে থাকা।

**সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ :** একটি কলেজের নাম।

**স্থানান্তর :** জায়গা বদল।

**স্নেহের প্রসাদে :** আদরে।

**স্বাবলম্বী :** স্বনির্ভর।

## পড়ে কী বুঝলাম

ক. এই লেখায় কী ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে?

খ. এই লেখার কোন তথ্যটি তোমার ভালো লেগেছে?

গ. এ ধরনের আর কী কী রচনা তুমি আগে পড়েছ?

ঘ. কাদের নিয়ে এ ধরনের লেখা তৈরি করা হয়?

ঙ. এই লেখা থেকে নতুন কী কী জানতে পারলে?

## বলি ও লিখি

‘রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন’ রচনায় লেখক যা বলেছেন, তা নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

## কীভাবে লিখব তথ্যমূলক লেখা

মূলত তথ্য উপস্থাপন করা হয় যেসব রচনায়, সেগুলো তথ্যমূলক লেখা। তথ্য নানা ধরনের হতে পারে। তাই তথ্যমূলক লেখাও নানা রকম হয়। জীবনীও এক ধরনের তথ্যমূলক লেখা। এছাড়া, বিভিন্ন ধরনের বিশ্বকোষ গ্রন্থে কিংবা অনলাইনে উইকিপিডিয়ায় বহু ধরনের তথ্যমূলক লেখা পাওয়া যায়।

তথ্যমূলক লেখার সাধারণ কিছু নিয়ম নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. কী নিয়ে লেখা হবে, তা ঠিক করতে হয়।
২. লেখাটিতে কী ধরনের তথ্য থাকবে, তা নিয়ে ভাবতে হয়।
৩. প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হয়।
৪. ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তথ্যগুলো সাজাতে হয়।
৫. বিষয়ের সাথে মিল রেখে লেখাটির একটি শিরোনাম তৈরি করতে হয়।
৬. তথ্যকে স্পষ্ট করতে ছবি, ছক, সারণি ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

## তথ্যমূলক রচনার প্রস্তুতি

তোমরা দলে ভাগ হও। এরপর শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসব তথ্য সংগ্রহ করো।

১. প্রতিষ্ঠার ইতিহাস
২. অবস্থান ও কাঠামো
৩. বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষার্থী
৪. বিভিন্ন কর্মকাণ্ড
৫. অর্জন ও কৃতিত্ব
৬. প্রতিষ্ঠানের ছবি

প্রতিটি দলের সংগ্রহ করা তথ্য আলাদা আলাদা কাগজে লিখে বড়ো কাগজে সেঁটে দাও। বড়ো কাগজটি এমন এক জায়গায় রাখো যাতে সবাই দেখতে পায়।

বড়ো কাগজে সেঁটে রাখা তথ্যগুলো কাজে লাগিয়ে একটি তথ্যমূলক রচনা তৈরি হতে পারে।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

# বিশ্লেষণমূলক লেখা

## তথ্য ও উপাত্তের বিশ্লেষণ

সব ধরনের লেখায় তথ্য থাকে। উপাত্ত থাকে বিভিন্ন ধরনের ছক, সারণি ও বিবরণের মধ্যে। এসব তথ্য ও উপাত্তকে বিশ্লেষণ করা হয় যেসব লেখায়, সেগুলোকে বিশ্লেষণমূলক লেখা বলে। বিশ্লেষণমূলক লেখা দুই ধরনের: (১) তথ্য বিশ্লেষণমূলক লেখা ও (২) উপাত্ত বিশ্লেষণমূলক লেখা।

নিচে একটি তথ্য বিশ্লেষণমূলক লেখা দেওয়া হলো। এটি আবদুল্লাহ আল-মুতীর লেখা। তিনি বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখক হিসেবে পরিচিত। বিজ্ঞানের অনেক জটিল বিষয়কে তিনি সহজ করে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত বই: 'এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে', 'আবিষ্কারের নেশায়', 'রহস্যের শেষ নেই' ইত্যাদি।

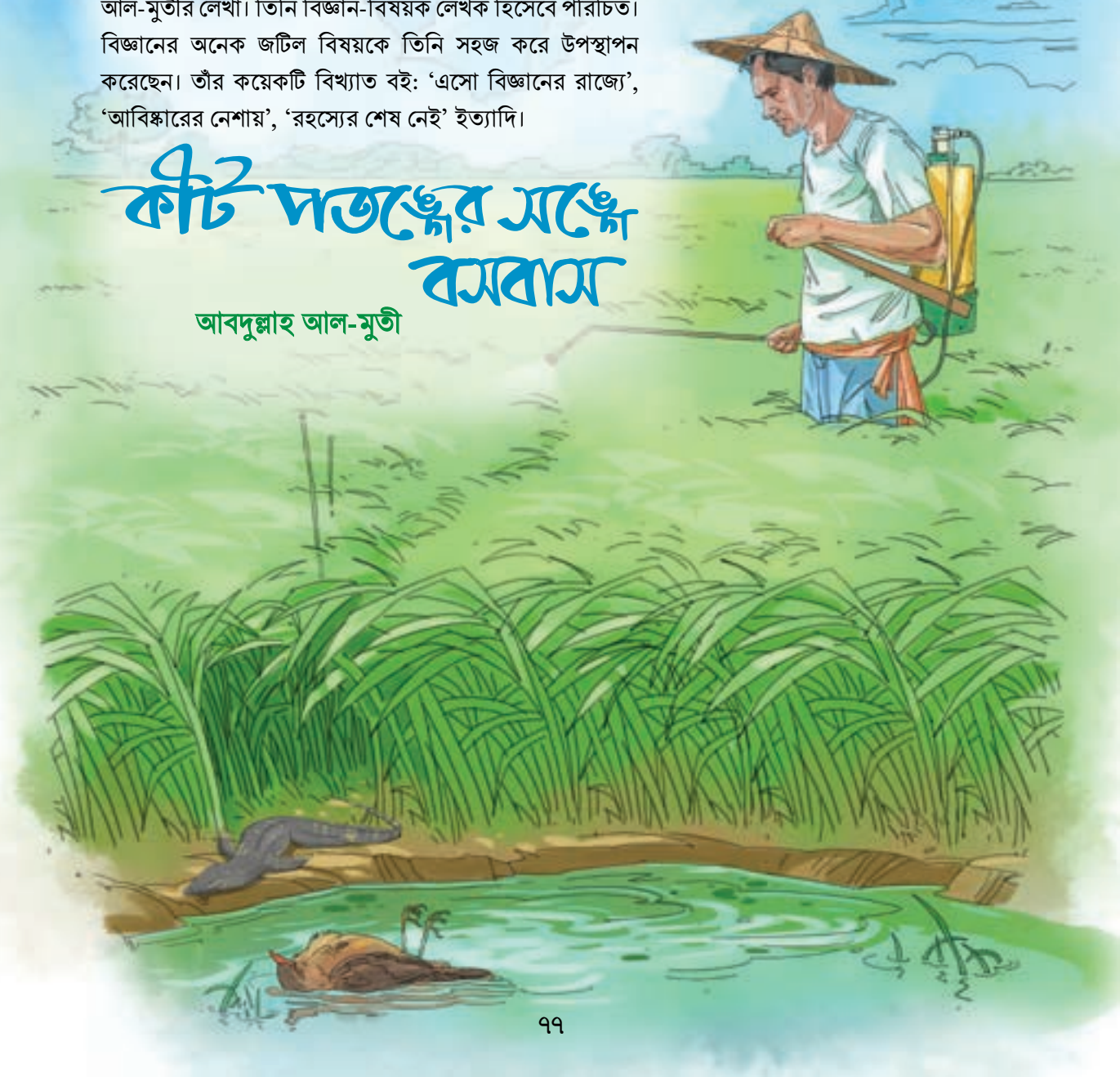

# কীট পতঙ্গের সঙ্গে বসবাস

আবদুল্লাহ আল-মুতী

প্রজাপতি আর মৌমাছিরা ফুল থেকে মধু খেতে গিয়ে ফুলে ফুলে পরাগযোগ ঘটায়; তাতেই খেতে ফসল ফলে, গাছে ফল ধরে। এসব উপকারী কীটপতঙ্গ ধ্বংস হলে কমে যায় খেতের ফসল, বাগানের ফলন। তাছাড়া পোকামাকড় খেয়ে বাঁচে অনেক পাখি আর অন্যান্য প্রাণী। কাজেই ঢালাওভাবে পোকামাকড় মেরে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়তে থাকে এসব প্রাণী।

ক্রমে ক্রমে আরো মারাত্মক একটা বিপদের কথা বিজ্ঞানীরা জানতে পেলেন। সে হলো অনেক জাতের কীটনাশকের গুণাগুণ সহজে নষ্ট হয় না। এগুলো পানির মধ্য দিয়ে, খাবারের মধ্য দিয়ে খুব অল্পমাত্রায় প্রাণীর দেহে বা মানুষের দেহে ঢুকে সেখানে চর্বিতে বা আর কোথাও জমে থাকতে পারে। এভাবে কীটনাশক জমে-ওঠার ফলে তার বিষক্রিয়ায় শুধু যে নানা রকম মারাত্মক রোগ হতে পারে তা নয়, মৃত্যুও ঘটতে পারে।

ধরা যাক কয়েক লাখ গাছের ওপর ছড়ানো হলো মাত্র এক গ্রাম কীটনাশক। এতে পাতার ওপর কীটনাশকের পরিমাণ হলো হয়তো মাত্র এক কোটি ভাগের এক ভাগ। তারপর এক লাখ পোকায় খেল এসব গাছ। পোকাদের শরীরে কীটনাশকের পরিমাণ দাঁড়াল দশ লাখে এক ভাগ। এবার শ-খানেক পাখি খেল এসব পোকা। পাখিদের শরীরে কীটনাশক হলো প্রতি লাখে এক ভাগ। এবার একটি বাজ খেল এমনি ক-টি পাখি। তার শরীরে বিষ হলো হাজার ভাগের এক ভাগ। দেখা গেল এভাবে বিষের কবলে অনেক নদী-হ্রদের পানিতে মাছ মরে যাচ্ছে, বিষাক্ত মাছ খেয়ে নানা জাতের পাখিও মরে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

সবটা মিলিয়ে অবস্থা দাঁড়াচ্ছে এই যে, কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে আমাদের চারদিকে পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে পড়ছে। তাতে শেষ পর্যন্ত মানুষেরই ক্ষতি হচ্ছে, অথচ যেসব ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ধ্বংস করার জন্য কীটনাশক তৈরি হয়েছিল তারা দিব্যি বিষকে গা-সওয়া করে নিয়ে বংশ বাড়িয়ে চলেছে।

এসব জানাজানি হবার পর আজ বিজ্ঞানীরা আবার প্রাকৃতিক উপায়ে কীটপতঙ্গ দমন করার ওপর জোর দিচ্ছেন। প্রকৃতির স্বাভাবিক ভারসাম্য বজায় থাকলে এমনিতে কীটপতঙ্গ অনেকটা দমন হয়। যেমন কাক, শালিক, চড়ুই, টুনটুনি—এসব পাখি খেতের পোকামাকড় ধরে খায়। কাজেই পাখি কমে গেলে পোকামাকড়ের সংখ্যা বাড়ে। আবার গোসাপ, ব্যাঙ, টিকটিকি এসব প্রাণী এবং অনেক পোকামাকড় ও অন্য পোকামাকড়দের ধরে খায়। গোসাপ, ব্যাঙ মেরে শেষ করলে পোকামাকড়ের সংখ্যা বেড়ে ওঠে।

এখন রাসায়নিক কীটনাশক যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করে অন্যভাবে ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ধ্বংস করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। যেমন, পাটের শুঁয়োপোকা আর মাজরাপোকা মারার ভালো উপায় হলো তাদের ডিম বা অল্প বয়সের কিড়া কুড়িয়ে নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া। অনেক পূর্ণবয়স্ক পোকা রাতের বেলা আলোর দিকে ছুটে আসে। এসব পোকাকে সহজেই আলোর ফাঁদ পেতে মারা যায়।

## শব্দের অর্থ

**কিড়া :** পোকা, কীট।

**কীটপতঙ্গ :** পোকামাকড়।

**কীটনাশক :** যে বিষ দিয়ে পোকামাকড় মারা হয়।

**গা-সওয়া :** সহনীয়।

**গুণাগুণ :** কার্যকারিতা।

**গোসাপ :** গুইসাপ।

**ঢালাওভাবে :** নির্বিচারে।

**পরাগযোগ :** পরাগরেণু যুক্ত হওয়া।

**বিষক্রিয়া :** বিষের কার্যকারিতা।

**ভারসাম্য :** সামঞ্জস্য।

**মাজরাপোকা :** ধানগাছের ক্ষতিকর পোকা।

**শুঁয়োপোকা :** সারা গায়ে লোমযুক্ত এক ধরনের পোকা।

**হ্রদ :** এক ধরনের জলাশয়।

## পড়ে কী বুঝলাম

ক. এই রচনাটি কোন বিষয় নিয়ে লেখা?

খ. লেখাটির মধ্যে কী কী বিশ্লেষণ আছে?

গ. বিবরণমূলক লেখার সাথে এই লেখাটির কী কী অমিল আছে?

ঘ. তথ্যমূলক লেখার সাথে এই লেখাটির কী কী অমিল আছে?

ঙ. এই লেখা থেকে নতুন কী কী জানতে পারলে?

## বলি ও লিখি

‘কীটপতঙ্গের সঙ্গে বসবাস’ রচনায় লেখক যা বলেছেন, তা নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

## কীভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়

‘কীটপতঙ্গের সঙ্গে বসবাস’ লেখাটির প্রথম অনুচ্ছেদের চারটি বাক্য খেয়াল করো। এখানে প্রথম বাক্যের তথ্য: পোকামাকড় পরাগায়ন ঘটায় বলে ফল ও ফসল হয়। দ্বিতীয় বাক্যের তথ্য: পোকামাকড় কমে গেলে ফসলের ফলন কমে যায়। তৃতীয় বাক্যের তথ্য: পোকামাকড় খেয়ে বহু প্রাণী বাঁচে। এরপর তিন বাক্যের তথ্য বিশ্লেষণ করে চতুর্থ বাক্যে লেখক সিদ্ধান্তে এসেছেন: পোকামাকড় নির্বিচারে মারা ঠিক নয়। এভাবে তথ্য বিশ্লেষণমূলক লেখায় নতুন সিদ্ধান্ত তৈরি হয়।

## কীভাবে উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়

উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয় যেসব লেখায়, সেগুলোকে উপাত্ত বিশ্লেষণমূলক লেখা বলে। উপাত্ত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তথ্য তৈরি হয়।

নিচের ছকে কিছু উপাত্ত আছে। এই ছকে দেশের নাম, বাঘের সংখ্যা এগুলো হলো উপাত্ত। ছকের উপাত্তগুলো বোঝার চেষ্টা করো এবং দলে আলোচনা করো।

| দেশের নাম | ২০১০ সাল পর্যন্ত বাঘের সংখ্যা | ২০১৫ সালের জরিপে বাঘের সংখ্যা |
|---|---|---|
| বাংলাদেশ | ৪৪০ | ১০৬ |
| ভুটান | ৭৫ | ১০৩ |
| কম্বোডিয়া | ৫০ | ০ |
| ভারত | ১৭০৬ | ২২২৬ |
| মিয়ানমার | ৮৫ | ৮৫ |
| নেপাল | ১২১ | ১৯৮ |
| থাইল্যান্ড | ২৫২ | ১৮৯ |
| ভিয়েতনাম | ২০ | ৫ |

উপরের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বহু তথ্যমূলক বাক্য রচনা করা যায়। যেমন, একটি বাক্য: ভিয়েতনামে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে চার ভাগের তিন ভাগ বাঘ কমেছে। আবার, আরেকটি বাক্য হতে পারে এমন: সবচেয়ে বেশি বাঘ আছে ভারতে।

এভাবে এই ছকের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে আরও কয়েকটি তথ্যমূলক বাক্য রচনা করো।

১. _____

২. _____

৩. _____

৪. _____

৫. _____

৬. _____

৭.

৮. _____

৯. _____

১০. _____

এসব তথ্যমূলক বাক্য ব্যবহার করে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করো। শুরুতে একটি শিরোনাম দাও।

_____

৫ম পরিচ্ছেদ

# কল্পনানির্ভর লেখা

বাংলাদেশে মানুষের মুখে মুখে অনেক রূপকথা চালু আছে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার রূপকথা সংগ্রহ করে কয়েকটি বই লিখেছিলেন। তাঁর লেখা এ রকম একটি বইয়ের নাম 'ঠাকুরমার ঝুলি'। সেখান থেকে একটা গল্প নিচে দেওয়া হলো।

## সাত ভাই চম্পা

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

এক রাজার সাত রানি। দেমাকে বড়ো রানিদের মাটিতে পা পড়ে না। ছোটো রানি খুব শান্ত। এজন্য রাজা ছোটো রানিকে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।

কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত রাজার ছেলেমেয়ে হয় না। এত বড়ো রাজ্য কে ভোগ করবে? রাজা মনের দুঃখে থাকেন।

এভাবে দিন যায়। কত দিন পরে—ছোটো রানির ছেলে হবে। রাজার মনে আনন্দ আর ধরে না। রাজার আদেশে পাইক-পেয়াদারা রাজ্যে ঘোষণা দিলেন—'রাজা রাজভান্ডার খুলে দিয়েছেন। মিঠাই-মন্ডা, মণি-মানিক যে যত পারো এসে নিয়ে যাও।'

বড়ো রানিরা হিংসায় জ্বলে মরতে লাগল।

রাজা নিজের কোমরে আর ছোটো রানির কোমরে এক সোনার শিকল বেঁধে দিয়ে বললেন, 'যখন ছেলে হবে, এই শিকলে নাড়া দিয়ো, আমি এসে ছেলে দেখব!' এই বলে রাজা রাজদরবারে গেলেন।

ছোটো রানির ছেলে হবে, আঁতুড়ঘরে কে যাবে? বড়ো রানিরা বললেন, 'আহা, ছোটো রানির ছেলে হবে, তা অন্য লোক দেবো কেন? আমরাই যাব।'

বড়ো রানিরা আঁতুড়ঘরে গিয়েই শিকলে নাড়া দিলেন। অমনি রাজসভা ভেঙে, ঢাক-ঢোলের বাদ্য দিয়ে, মণি-মানিক হাতে রাজা এসে দেখেন—কিছুই না!

রাজা ফিরে গেলেন।

রাজা সভায় বসতে-না-বসতেই আবার শিকলে নাড়া পড়ল।

রাজা আবার ছুটে গেলেন। গিয়ে দেখেন, এবারও কিছু না। মনের কষ্টে রাজা রাগ করে বললেন, 'ছেলে না-হতে আবার শিকল নাড়া দিলে আমি সব রানিকে কেটে ফেলব।' এই বলে রাজা চলে গেলেন।

একে একে ছোটো রানির সাতটি ছেলে ও একটি মেয়ে হলো। আহা ছেলে-মেয়েগুলো যেন চাঁদের পুতুল—ফুলের কলি। আঁকুপাঁকু করে হাত নাড়ে, পা নাড়ে—আঁতুড়ঘর আলো হয়ে গেল।

ছোটো রানি আস্তে আস্তে বললেন, 'দিদি, কী ছেলে হলো একবার দেখালি না!'

বড়ো রানিরা ছোটো রানির মুখের কাছে রঙ্গ-ভঙ্গি করে হাত নেড়ে, নথ নেড়ে বলে উঠল, 'ছেলে না, হাতি হয়েছে—ওর আবার ছেলে হবে!—কয়টা ইঁদুর আর কয়টা কাঁকড়া হয়েছে।'

শুনে ছোটো রানি অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলেন।

নিষ্ঠুর বড়ো রানিরা আর শিকলে নাড়া দিলো না। চুপিচুপি হাঁড়ি-সরা এনে, ছেলে-মেয়েগুলিকে তাতে পুরে, পাঁশগাদায় পুঁতে ফেলে এলো। এসে, তারপর শিকল ধরে টান দিলো।

রাজা আবার ঢাক-ঢোলের বাদ্য দিয়ে, মণি-মানিক হাতে এলেন। বড়ো রানিরা হাত মুছে, মুখ মুছে তাড়াতাড়ি করে কতকগুলি ব্যাঙের ছানা, ইঁদুরের ছানা এনে দেখাল। দেখে রাজা আগুন হয়ে ছোটো রানিকে রাজপুরী থেকে বের করে দিলেন।

বড়ো রানিদের মুখে আর হাসি ধরে না; পায়ের মলের বাজনা থামে না, সুখের কাঁটা দূর হলো; রাজপুরীতে আগুন দিয়ে, ঝগড়া-কোন্দল সৃষ্টি করে ছয় রানিতে মনের সুখে ঘরকন্না করতে লাগলেন।

পোড়াকপালী ছোটো রানির দুঃখে গাছ-পাথর ফাটে, নদী-নালা শুকায়—ছোটো রানি ঘুঁটে-কুড়ানি দাসী হয়ে পথে পথে ঘুরতে লাগলেন।

এমনি করে দিন যায়। রাজার মনে সুখ নেই, রাজার রাজ্যে সুখ নেই—রাজপুরী খাঁখাঁ করে, রাজার বাগানে ফুল ফোটে না।

একদিন মালি এসে বলল, 'মহারাজ, ফুল তো ফোটে না। তবে আজ পাঁশগাদার উপরে সাতটি চাঁপা গাছে ও একটি পারুল গাছে টুলটুলে সাতটি চাঁপা ফুল আর একটি পারুল ফুল ফুটে রয়েছে।'

রাজা বললেন, 'তবে সেই ফুল আনো।'

মালি ফুল আনতে গেল।

মালিকে দেখে পারুল গাছে পারুল ফুল চাঁপা ফুলগুলোকে ডেকে বলল, 'সাত ভাই চম্পা জাগো রে!'

অমনি সাত চাঁপা নড়ে উঠে সাড়া দিল—'কেন বোন পারুল ডাকো রে?'

পারুল বলল, 'রাজার মালি এসেছে, ফুল দেবে কি না দেবে?'

সাত চাঁপা তুরতুর করে উপরে উঠে গিয়ে ঘাড় নেড়ে বলতে লাগল, 'না দেবো না দেবো ফুল, উঠব শতেক দূর, আগে আসুক রাজা, তবে দেবো ফুল!'

দেখে শুনে মালি অবাক হয়ে গেল। ফুলের সাজি ফেলে দৌড়ে গিয়ে রাজার কাছে খবর দিলো।

আশ্চর্য হয়ে রাজা আর রাজসভার সবাই সেখানে এলেন।

রাজা এসে ফুল তুলতে গেলেন, অমনি পারুল ফুল চাঁপা ফুলদের ডেকে বলল, 'সাত ভাই চম্পা জাগো রে!'

চাঁপারা উত্তর দিলো, 'কেন বোন পারুল ডাকো রে?'

পারুল বলল, 'রাজা নিজে এসেছেন, ফুল দেবে কি না দেবে?'

চাঁপারা বলল, 'না দেবো না দেবো ফুল, উঠব শতেক দূর, আগে আসুক রাজার বড়ো রানি, তবে দেবো ফুল!' এই বলে চাঁপা ফুলেরা আরও উঁচুতে উঠল।

রাজা বড়ো রানিকে ডাকালেন। বড়ো রানি মল বাজাতে বাজাতে এসে ফুল তুলতে গেলেন। চাঁপা ফুলেরা বলল, 'না দেবো না দেবো ফুল, উঠব শতেক দূর, আগে আসুক রাজার মেজো রানি, তবে দেবো ফুল!'

তারপর মেজো রানি এলেন, সেজো রানি এলেন, নোয়া রানি এলেন, কনে রানি এলেন, কেউই ফুল পেলেন না। ফুলেরা গিয়ে আকাশে তারার মতো ফুটে রইল।

রাজা গালে হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়লেন।

শেষে দুয়ো রানি এলেন; তখন ফুলেরা বলল, 'না দেবো না দেবো ফুল, উঠব শতেক দূর, যদি আসে রাজার ঘুঁটে-কুড়ানি দাসী, তবে দেবো ফুল।'

তখন খোঁজ-খোঁজ পড়ে গেল। রাজা চৌদোলা পাঠিয়ে দিলেন, পাইক-বেহারারা চৌদোলা নিয়ে মাঠে গিয়ে ঘুঁটে-কুড়ানি দাসী ছোটো রানিকে নিয়ে এল।

ছোটো রানির হাতে পায়ে গোবর, পরনে ছেঁড়া কাপড়, তাই নিয়ে তিনি ফুল তুলতে গেলেন। অমনি সুড়সুড় করে চাঁপারা আকাশ থেকে নেমে এল, পারুল ফুলটি গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশল। ফুলের মধ্য থেকে সুন্দর সুন্দর চাঁদের মতো সাত রাজপুত্র আর এক রাজকন্যা 'মা' 'মা' বলে ডেকে ঝুপঝুপ করে ঘুঁটে-কুড়ানি দাসী ছোটো রানির কোলে-কাঁখে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সকলে অবাক! রাজার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে গেল। বড়ো রানিরা ভয়ে কাঁপতে লাগল।

রাজা তখনি বড়ো রানিদের কঠিন শাস্তি দিয়ে সাত রাজপুত্র, পারুল-রাজকন্যা আর ছোটো রানিকে নিয়ে রাজপুরীতে গেলেন। রাজপুরীতে জয়ডঙ্কা বেজে উঠল।

(পরিমার্জিত)

## শব্দের অর্থ

**আঁতুড়ঘর :** যে ঘরে শিশুর জন্ম হয়।

**কাঁখ :** কোমর।

**ঘুঁটে :** শুকনা গোবর।

**ঘুঁটে-কুড়ানি :** ঘুঁটে কুড়ায় যে।

**চৌদোলা :** পালকি।

**জয়ডঙ্কা :** বড়ো ঢাক।

**দেমাক :** অহংকার।

**নথ :** নাকে পরার অলংকার।

**পাইক :** লাঠিয়াল।

**পাঁশগাদা :** ছাইয়ের স্তূপ।

**পেয়াদা :** সংবাদবাহক।

**বেহারা :** পালকিবাহক।

**মল :** পায়ের অলংকার।

**রাজভান্ডার :** কোষাগার।

**হাঁড়ি-সরা :** হাঁড়ি ও তার ঢাকনা।

## পড়ে কী বুঝলাম

ক. আগে এ ধরনের আর কোন গল্প পড়েছ? _____

_____

খ. 'সাত ভাই চম্পা' গল্পে কী কী চরিত্র আছে? _____

_____

গ. এখানকার কোন কোন ঘটনা বাস্তবে হয় না? _____

_____

ঘ. এখানকার কোন কোন ঘটনা বাস্তবেও ঘটতে পারে? _____

_____

ঙ. এই গল্প পড়ে আমরা কী বুঝলাম? _____

_____

## বলি ও লিখি

‘সাত ভাই চম্পা’ গল্পটি নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

## বিভিন্ন রকম কল্পকাহিনি

এমন কিছু গল্প আছে যেগুলোর মধ্যে অনেক ঘটনা বাস্তবের সাথে মেলে না। এগুলোকে কাল্পনিক গল্প বা কল্পকাহিনি বলে। কল্পকাহিনি পড়তে বা শুনতে আমাদের ভালো লাগে, অনেক কিছু জানাও যায়। নিচে তিন ধরনের কল্পকাহিনির পরিচয় দেওয়া হলো।

**রূপকথা:** রূপকথা এক ধরনের শিশুতোষ গল্প, যেখানে মানুষের পাশাপাশি রাক্ষস-দৈত্য, ডাইনি-পরি, ভূত-পেতনি ইত্যাদি কাল্পনিক চরিত্র থাকে।

**উপকথা:** মূলত পশু-পাখি নিয়ে রচিত গল্পকে উপকথা বলে। উপকথার পশু-পাখিরা মানুষের মতো আচরণ করে।

**বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি:** বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে লেখা কাল্পনিক গল্পকে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি বলে।